بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ এপ্রিল, ২০১৯ মোতাবেক ২৬ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত উসমান বিন মাযঊন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করেছিলাম যে, জান্নাতুল বাকী-তে সমাহিত ব্যক্তিদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। জান্নাতুল বাকী'র ভিত্তি ও সূচনা সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো মহানবী (সা.) এর মদিনায় সুভাগমনের পর সেখানে অনেক কবরস্থান ছিল। ইহুদীদের নিজস্ব গোরস্থান ছিল। এর পাশাপাশি আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিজ নিজ কবরস্থান ছিল। মদিনা তৈয়্যবা যেহেতু তখন বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত ছিল তাই প্রত্যেক গোত্র নিজ এলাকায় খোলা স্থানে নিজেদের মৃতদের কবরস্থ করত। কুবার নিজস্ব কবরস্থান ছিল যা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সেখানে ছোট ছোট আরো বেশ কিছু কবরস্থান ছিল, যেমন- বনু জাফর গোত্রের নিজস্ব কবরস্থান ছিল আর বনু সালামার পৃথক কবরস্থান ছিল। অন্যান্য কবরস্থানের মাঝে ছিল বনু সাদার কবরস্থান, যেখানে পরবর্তীতে 'সূকুন্নবী' প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্থানে মসজিদে নববী নির্মিত হয়েছে সেখানেও খেজুর বাগানে কয়েকজন মুশরেকের কবর ছিল। এসব কবরস্থানের মাঝে বাকীউল গরকদ সবচেয়ে পুরোনো ও প্রসিদ্ধ কবরস্থান ছিল। এরপর মহানবী (সা.) যখন এটিকে মুসলামনদের কবরের জন্য পছন্দ করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদা চলে আসছে আর তা চিরকাল থাকবে।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আবু রাফের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) কোন এমন জায়গার সন্ধানে ছিলেন যেখানে শুধু মুসলমানদের কবর থাকবে আর সে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। এই গর্ব বাকীউল গরকদের অদৃষ্টে লেখা ছিল যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে এই জায়গা অর্থাৎ বাকীউল গরকদকে নির্বাচনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটিকে সে যুগে বাকীউল খাবখাবা বলা হতো। তাতে অগণিত গরকদ বৃক্ষ ও বন্য ঝোপঝাড় ছিল। মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের রাজত্ব ছিল সেখানে। আবর্জনা বা জঙ্গলের কারণে যখন মশা উড়তো তখন এমন মনে হতো যেন ধোঁয়ার মেঘ ছেয়ে গেছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানে সর্বপ্রথম যাকে কবরস্থ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। মহানবী (সা.) তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথর চিহ্ন হিসেবে রেখে দেন আর বলেন, ইনি আমাদের পূর্বসূরী। এরপর যখনই কারো ঘরে কেউ মারা যেতো তারা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করতো যে, তাকে কোথায় দাফন করা উচিত? তিনি বলতেন আমাদের পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊনের পাশে। আরবী ভাষায় এমন স্থানকে 'বাকী' বলা হয় যেখানে অজস্র গাছপালা হয়ে থাকে। মদিনা শরীফে এই স্থান বাকীউল গরকদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে কেননা সেখানে অনেক বেশি গরকদ বৃক্ষ ছিল। এছাড়া সেখানে অন্যান্য ধরনের বন্য মরু গুল্মলতাও ছিল অনেক বেশি। এটিকে জান্নাতুল বাকীও বলা হয়। আরবী ভাষায় জান্নাতের একটি অর্থ হলো বাগান বা ফিরদাওস। সে কারণে বেশীর ভাগ অনারব পর্যটকদের মাঝে তা জান্নাতুল বাকী হিসেবে পরিচিত। আব্দুল হামীদ কাদেরী সাহেব এর

বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আরবরা সচরাচার নিজেদের মাকবেরা ও কবরস্থানকে জান্নাতী বলেই ডাকে। এর একটি নাম হলো মাকাবেরুল বাকী, যা মরুবাসীদের মাঝে বেশি পরিচিত। হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন কেউ মারা যেতো তখন মহানবী (সা.) বলতেন, একে আমাদের প্রয়াত লোকদের মাঝে পাঠিয়ে দাও, উসমান বিন মাযঊন আমার উম্মতের কতই না উত্তম পূর্বসূরী ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত উসমানের মৃত্যু হয় তখন মহানবী (সা.) তার মরদেহেরে কাছে আসেন। তিনি তিনবার তার লাশের প্রতি ঝুঁকেন এবং মাথা উঠান আর উচ্চস্বরে বলেন, হে আবু সায়েব খোদা তোমার প্রতি মার্জনা করুন। তুমি পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় প্রস্থান করেছ যে, ইহজগতের কোন কিছুর মাধ্যমে কলুষিত হওনি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊনের লাশকে চুমু খান, তখন তিনি কাঁদছিলেন, তাঁর উভয় চোখ থেকে অশ্রুধারা বহমান ছিল। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, হযরত উসমানের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তাঁকে চুমু খান। তিনি বলেন, আমি দেখেছি মহানবী (সা.) এর অশ্রুধারা হযরত উসমানের গালের ওপর পড়ছিল। অর্থাৎ চোখের পানি এত বেশি ছিল যে, তা গড়িয়ে হযরত উসমানের মুখে পড়তে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহীম যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, الحق بالسلف الصالح عثمان ابن مظعون। অর্থাৎ পুণ্যবান পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊনের সাথে গিয়ে মিলিত হও। হযরত উসমান বিন আফফানের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊনের জানাযার নামায পড়িয়েছেন আর চার তকবীর দিয়েছেন। কেউ কেউ অনেক সময় বলে যে, তিনের অধিক তকবীর দেয়া যায় না অথচ চার তকবীরেরও প্রমাণ আছে। মুত্তালিব বিন বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন তার লাশ বের করা হয় আর তাকে দাফন করা হয়। তখন মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনার নির্দেশ দেন। তিনি পাথর উঠাতে পারেন নি অর্থাৎ খুব ভারী পাথর ছিল। তখন মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন বা নিজে তার কাছে যান। তিনি তাঁর উভয় হাত বা উভয় বাহুর কাপড় অর্থাৎ কামিযের আস্তিন উপরে উঠান। মুত্তালিব বা যিনি মহানবীর পক্ষ থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনও মহানবী (সা.)-এর উভয় বাহুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। এখনও সে ঘটনা আমার স্মৃতিপটে অম্লান। মহানবী (সা.)-এর বাহু খুবই সুন্দর ছিল। তিনি যখন উভয় বাহু অনাবৃত করেন আর আস্তিন উপরে উঠান, তার সৌন্দর্য যেন আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি সেই পাথর উঠান আর উসমান বিন মাযঊনের মাথার দিকে সংস্থাপন করেন এবং বলেন, আমি এই চিহ্নের মাধমে আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করব আর আমার বংশের যে-ই ইন্তেকাল করবে, তাকে আমি এর কাছে কবরস্থ করব। (সুনান আবি দাঊদ)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত উসমান বিন মাযঊনের ইন্তেকালের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা থেকে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব দ্বিতীয় হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা করে বলেন,

সে বছর শেষের দিকে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের জন্য মদিনায় একটি কবরস্থান নির্ধারণ করেন যাকে জান্নাতুল বাকী বলা হতো। এরপর সাধারণত সাহাবীরা সেই মাকবেরায় কবরস্থ হতেন। সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি এ মাকবেরায় সমাহিত হন তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। উসমান অতি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একজন

অত্যন্ত পুণ্যবান, ইবাদতগুজার ও সূফী মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর একবার তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেন আমি সম্পূর্ণভাবে এ জগৎ পরিত্যাগ করে, স্ত্রী-সন্তান হতে পৃথক হয়ে, জীবন পুরোপুরি খোদার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করতে চাই, আমায় অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু তিনি (সা.) এর অনুমতি দেন নি। গত খুতবায় আমি এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। যাহোক হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, হযরত উসমান বিন মাযঊনের মৃত্যুতে মহানবী (সা.) গভীরভাবে মর্মাহত হন। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মৃত্যুর পর তিনি (সা.) তার ললাটে চুমু খান। তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তাকে সমাহিত করার পর তিনি (সা.) চিহ্নিত করার মানসে তার কবরে একটি পাথর সংস্থাপিত করান। এরপর তিনি (সা.) কখনো কখনো জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। মদিনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির ছিলেন হযরত উসমান। হযরত উসমান বিন মাযঊনের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী শোকগাঁথায় যা লিখেছেন তাহলো-

یاعین جودی بالدمع غیر ممنوع، علی رضیة عثمان بن مظعون
الامرء بات فی رضوان الخالق، طوبی له من فقید الشخص المدفون
طالب البقیع له السقنة وغرقد، واشرقت ارضه من بعدناعین
واورثا القلب حزنا لانقطاع له، حتی الممات فماترک له شنید

এর অনুবাদ হলো, হে চক্ষু! উসমানের মৃত্যুতে তুমি অনবরত অশ্রুপাত করে যাও, সে ব্যক্তির মৃত্যুতে, যে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির সন্ধানে রাত অতিবাহিত করত। তার জন্য শুভসংবাদ, এমন এক ব্যাক্তি এখানে সমাহিত হয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। বাকীউল গরকদ স্বীয় এই অধিবাসীর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে গেছে আর তার সমাহিত হওয়ার পর এর ভূমি আলোকিত হয়ে গেছে। তার মৃত্যুতে হৃদয় এমনভাবে ব্যাথাতুর হয়েছে যা মৃত্যু পর্যন্ত কাটার নয় আর আমার এই অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। অর্থাৎ তার স্ত্রী এই ভাবাবেগ প্রকাশ করেন।

মহানবী (সা.)-এর কাছে বয়াতকারিনী এক আনসারী মহিলা হযরত উম্মে আলা বলেন, আনসাররা যখন মুহাজেরদের বসবাসের বিষয়ে লটারী করে তখন হযরত উসমান বিন মাযঊনের নাম আমাদের ভাগে আসে। অর্থাৎ আমাদের ঘর তাকে রাখার জন্য নির্ধারিত হয়। হযরত উম্মে আলা বলতেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ঘরে অবস্থান করেন। তিনি অসুস্থ হলে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করি আর তিনি মারা গেলে আমরা তাকে তার (পরিহিত) কাপড়েই কবরস্থ করি। মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন। হযরত উম্মে আলা বলেন, আমি বলি, তোমার প্রতি খোদার রহমত বর্ষিত হোক হে আবু সায়েব! এটি হযরত উসমান বিন মাযঊনের ডাক নাম ছিল। তিনি মহানবী (সা.) এর সামনে এই শব্দ উচ্চারণ করেন যে, আবু সায়েব! তোমার প্রতি খোদার কৃপা হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এটিই যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে সম্মান দিয়েছেন। মহানবী (সা.) এর সামনে তিনি এই সাক্ষ্য দেন। উম্মে আলা বলেন, মহানবী (সা.) তার কাছে একথা শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তাকে সম্মান দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত; আমি জানি না। এটি কেবল আমার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তখন মহানবী (সা.) বলেন, উসমানের যতটুকু সম্পর্ক আছে তিনি এখন প্রয়াত, আর আমি তার জন্য মঙ্গলেরই

আশা রাখি, এই আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তাকে সম্মানিত করবেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, খোদার কসম, আমিও জানি না যে, উসমানের সাথে কী করা হবে। দোয়া অবশ্যই আছে, কিন্তু এটি আমি বলতে পারি না যে, অবশ্যই সম্মান দিয়েছেন, অথচ আমি খোদার রসূল। একথা শুনে হযরত উম্মে আলা বলেন, খোদার কসম, এরপর আর কাউকে আমি এভাবে পবিত্র আখ্যায়িত করব না অর্থাৎ এ ধরনের শব্দের পুনরাবৃত্তি করব না যে, তুমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছ। একথা আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে। তিনি বলেন, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়ি। এক বিশেষ সম্পর্ক এবং আবেগ ছিল। যাহোক তিনি বলেন, রাতে যখন আমি ঘুমাই স্বপ্নে হযরত উসমানের একটি ঝর্ণা আমাকে দেখানো হয়েছে যা প্রবহমান ছিল। প্রবহমান একটি প্রস্রবণ ছিল, আর দেখানো হয়েছে যে, এটি হযরত উসমানের। তিনি বলেন, এ স্বপ্ন দেখার পর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে আসি এবং তাঁকে বলি যে, আমি এভাবে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, প্রবহমান এই প্রস্রবন বা ঝর্ণা হলো তার কর্ম বা আমল। আল্লাহ তা'লা তোমাকে দেখিয়েছেন যে, তিনি এখন জান্নাতে আর বহমান এই ঝর্ণা হলো তার কর্ম বা আমল। অতএব এটিও মহানবী (সা.) এর তরবিয়তের একটি রীতি ছিল। অর্থাৎ এত নিশ্চিৎভাবে খোদার ক্ষমা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে যেয়ো না। হ্যাঁ স্বপ্নে যখন হযরত উসমান বিন মাযঊনের উন্নত কর্ম একটি ঝর্ণারূপে হযরত উম্মে আলাকে দেখানো হয় তখন মহানবী (সা.) এর সত্যায়ন করেন, নতুবা মহানবী (সা.) জানতেন যে, এসব বদরী সাহাবীদের প্রতি খোদা সন্তুষ্ট। আর স্বয়ং মহানবী (সা.) এর দোয়া এবং তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন তা থেকে স্পষ্ট যে, তার সম্পর্কে তাঁর (সা.) বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'লা দোয়া শুনবেন আর তিনি আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হবেন। কিন্তু তবুও তিনি বলেন যে, আমরা কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি না।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এই বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খারেজা বিন যায়েদ তার মায়ের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন খারেজা বিন যায়েদের মা বলেন, আবু সায়েব! তুমি পবিত্র, তোমার ভালো দিন খুবই ভালো ছিল। মহানবী (সা.) একথা শুনতে পান এবং বলেন কে? তিনি বলেন, আমি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাকে একথা কিসে অবহিত করেছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! উসমান বিন মাযঊনের আমল বা ইবাদত এমন ছিল যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, খোদা তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করেছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমরা উসমান বিন মাযঊনের মাঝে পুণ্য ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। নিশ্চয় উসমান বিন মাযঊন এমন মানুষ ছিলেন যার মাঝে নেকী ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিনি। কিন্তু একই সাথে তিনি (সা.) বলেন, স্মরণ রেখো আমি আল্লাহ্‌র রসূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার কসম, আমিও জানি না যে, আমার সাথে কী করা হবে। খোদা তা'লার কাছে মহানবী (সা.) এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই, তিনি খোদার প্রেমিক বা বন্ধু, কিন্তু খোদা তা'লার ভ্রুক্ষেপহীনতা, তাঁর ভয় ও ভীতির চিত্র দেখুন যে, নিজের সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন যে, আমি জানিনা আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অতএব আমাদের জন্য কতটা ভয়ের ব্যাপার আর কতটা আমাদের পুণ্য কর্ম ও খোদার ইবাদতে মনোযোগ নিবদ্ধ করার বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত! আর তা সত্ত্বেও অহংকার নয় বরং বিনয়ে ক্রমাগতভাবে উন্নতি করা উচিত আর সর্বদা খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ভিক্ষা যাচনা করতে থাকা উচিত যেন তিনি স্বীয় করুণা ও কৃপাগুণে আমাদের ক্ষমা করে দেন। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের অপর একটি

রেওয়াতে এটিও উল্লিখিত আছে যে, হযরত উম্মে আলা বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করি। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমরা তাকে তার পরিহিত কাপড়ে আবৃত করে দেই। মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে আসেন। আমি বলি, হে আবু সায়েব! আপনার প্রতি আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হোক, আপনার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য হলো, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করেছেন, অনেক সম্মান দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাকে কে বলেছে যে, আল্লাহ্ তালা তাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমি জানি না। মহানবী (সা.) বলেন, তার যতটুকু সম্পর্ক আছে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার চিরসত্য ডাক অর্থাৎ মৃত্যু এসে গেছে। আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি, অর্থাৎ তার সাথে আল্লাহ তা'লার ব্যবহার শুভ হবে। কিন্তু খোদার কসম, আমি আল্লাহ্র রসূল, কিন্তু আমিও জানি না আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরপর আর কখনো কাউকে পবিত্র আখ্যা দেবো না। তিনি বলেন, এরপর এ কারণে আমার অনুশোচনা হয়। অতঃপর তিনি সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং মহানবী (সা.)-কে সেই স্বপ্ন শুনান। পৃথক পৃথক দু'টি হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছেন, আর মহানবী (সা.)-এর দোয়াও তাদের অনুকূলে ছিল। খোদা ক্রমাগতভাবে তাদের মর্যাদা উন্নীত করুন। সেই পুণ্য আদর্শ যেন আমরাও নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারি-খোদার কাছে এই দোয়াই থাকবে।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত ওহাব বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্। ওহাবের পিতার নাম ছিল সা'দ। তিনি বনু আমের বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্-র ভাই ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল মুহানা বিনতে জাবের, যিনি আশআরী গোত্রের সদস্যা ছিলেন। হযরত ওহাবের ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ ওহীর সেই কাতেব ছিল যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তার ভাই-সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর একজন ওহী-লেখক ছিল, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্। সীরাতুল হালবিয়ায় লেখা আছে যে, তিনি হযরত উসমান বিন আফফানের দুধ ভাই ছিলেন। যাহোক মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন কোন ওহী অবতীর্ণ হতো, তিনি (সা.) তাকে ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। একদিন তিনি সূরাতুল মু'মিনূনের আয়াত ১৪ ও ১৫ লেখাচ্ছিলেন। তিনি যখন ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন ওহীর লেখকের মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ। সূরাতুল মু'মিনূনের ১৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন এটিই ওহী, এটিকেই লিখে নাও। সেই দুর্ভাগা ভাবল না যে, পিছনের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই এই আয়াতাংশ আসা উচিত, বরং সে মনে করলো, যেভাবে আমার মুখ থেকে এই আয়াত বেরিয়েছে আর মহানবী এটিকে ওহী আখ্যা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই নাঊযুবিল্লাহ্ পুরো কুরআন তিনি নিজেই বানাচ্ছেন। ফলাফল-স্বরুপ সে মুরতাদ হয়ে মক্কা চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় যাদেরকে মহানবী (সা.) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মাঝে একজন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ও ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে আশ্রয় দান করেন। সেই আশ্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ হলো, মক্কা বিজয়ের সময় যখন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সে তার দুধভাই হযরত উসমান

বিন আফফানের কাছে আশ্রয়ের জন্য যায় এবং তাকে বলে, হে ভাই! মহানবী (সা.) আমার শিরোচ্ছেদ করার পূর্বে আমাকে তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে দাও। (সীরাতুল হালবিয়া)। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, সে তার ঘরে তিন-চার দিন আত্মগোপন করে থাকে। একদিন মহানবী যখন মক্কাবাসীদের বয়আত নিচ্ছিলেন তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্কে তাঁর কাছে নিয়ে যান এবং তার বয়আত নেয়ার আবেদন করেন। মহানবী (সা.) প্রথমে কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি তার বয়আত গ্রহণ করেন। এভাবে সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। তার আরো অনেক বিষয় ছিল যার কারণে এই আদেশ দেয়া হয়েছিল। বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য ছড়ানোর অপরাধও ছিল। শুধু এটিই কারণ ছিল না যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত ওহাব যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদাম এর ঘরে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ওহাব এবং হযরত সুআয়েদ বিন আমর এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তারা উভয়ে, অর্থাৎ যে দুজনের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়েছিল, মুতার যুদ্ধের দিন শহীদ হন। হযরত ওহাব বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়া ও খায়বারে অংশ নেন, আর অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলা-য় মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদতের দিন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। মুতার যুদ্ধ কী ছিল বা এর কারণ কী ছিল- এ সম্পর্কে তাবাকাতুল কুবরা-তে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন উমায়ের-কে দূত হিসেবে বসরা'র অধিপতির কাছে একটি পত্রসহ প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তাকে শারাহবীল বিন উমর গাস্সানি বাধা দেয় এবং শহীদ করে। সীরাতুল হালবিয়া অনুযায়ী শারাহবীল কায়সারের পক্ষ থেকে সিরিয়ার জন্য নির্ধারিত আমীরদের একজন ছিল। হযরত হারেস বিন উমায়ের ব্যাতিরেকে মহানবী (সা.) এর আর কোন দূতকে শহীদ করা হয়নি। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মহানবী (সা.) অত্যন্ত দুঃখ পান। তিনি খুবই মর্মাহত হন। তিনি (সা.) মানুষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন। মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মহানবী (সা.) বলেন, তাদের সবার আমীর হলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা। এরপর একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে হযরত যায়েদকে দেয়ার সময় তিনি (সা.) এই নসীহত করেন যে, হযরত হারেস বিন উমায়েরকে যেখানে শহীদ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে মানুষকে ইসলামের তবলীগ করুন। যদি তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে ঠিক আছে, নতুবা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। হযরত ওহাবও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধের আরো কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি- হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) মুতার অভিযানের জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর নির্ধারণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হন তাহলে জাফর আমীর হবেন, আর যদি জাফরও শহীদ হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা তোমাদের আমীর হবেন। এই বাহিনীকে জয়েশ-এ-উমারাও বলা হয়। এর বর্ণনায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এতটাই লিখেছেন যে, একটি বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, তখন সেখানে কাছেই এক ইহুদীও বসেছিল। মহানবী (সা.) এর এই কথা শুনে সে হযরত যায়েদের কাছে আসে এবং বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের তিন জনের মধ্য থেকে কেউ-ই জীবিত ফিরে আসবে না। তখন হযরত যায়েদ

বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসি বা না আসি কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল এবং নবী। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এই যুদ্ধের অবস্থা অর্থাৎ শহীদদের বিষয়ে অবগত হন। এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যায়েদ ঝাণ্ডা বা পতাকা হাতে নেন এবং শহীদ হন। এরপর জাফর তা ধরেন এবং তিনিও শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তিনিও শহীদ হন- এই সংবাদ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর তিনি বলেন, অতঃপর খালেদ বিন ওয়ালীদ সর্দার না হওয়া সত্ত্বেও ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তিনি বিজয় লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। তাদের স্মৃতিচারণের পর এখন আমি কতিপয় মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও আজ আমি পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হবে মোকাররম মালেক মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের যিনি জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। গতকাল ২৫ এপ্রিল তারিখে ম্যানচেস্টারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার জানাযা এখানে উপস্থিত রয়েছে। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি বাহিরে গিয়ে তার জানাযা পড়াব। ১৯৪৭ সনের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি গুজরাত জেলার মালেকওয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬১ সনে তিনি নিজে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তার আপন বড় ভাই মাস্টার আজম সাহেব প্রথমে আহমদী হয়েছিলেন। তিনিও নিজে বয়আত করেছিলেন। তার মাধ্যমেই তিনি (অর্থাৎ মরহুম) বয়আত করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি এটিই লিখেছিলেন যে, আমি শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাবওয়া আসি এবং এরপর রাবওয়ার পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে বয়আত করি। যাহোক বয়আতের পর ১৯৬২ সনে তিনি জামা'তের সেবায় নিজেকে ওয়াকফ করেন। বি এ করার পর তিনি শাহেদ করেন এবং আরবীতে ফযেল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭১ সনে তিনি মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে পদায়িত হন। ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) মৌলভী আব্দুল বাশারত আব্দুল গফুর সাহেবের কন্যা আমাতুল করীম সাহেবার সাথে তার বিয়ে পড়ান। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ড, ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো এবং কার্ডিফ জামা'তে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার মোট সেবাকাল ৪৮ বছর দাঁড়ায়। তিনি যুক্তরাজ্যে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত নায়েব অফিসার জলসাগাহ্'র দায়িত্বও পালন করেছেন। ৭১ থেকে ৭২ বরং ৭৩ সন পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেন। এরপর ৭৩ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত গাম্বিয়ায় কাজ করেন। এরপর পুনরায় ৭৭ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের করাচীতে কাজ করেন। এরপর ৭৯ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র রাবওয়ায় ওকালতে তবশীরে কাজ করেন। ৮০ থেকে ৮৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়া মিশনারী কলেজ 'হিলারো'র প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর তিনি পুনরায় রাবওয়া আসেন এবং ৮৯ সাল পর্যন্ত রাবওয়ায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি ৮৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। আর নিজের অসুস্থতার কারণে, প্রথমে নিজের বয়সের কারণে তিনি ২০07 সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসরপ্রাপ্ত হন। এরপর পুনরায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আর ২০১৮ সন পর্যন্ত তিনি সেবা করার সুযোগ লাভ করতে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ অসুস্থতার কারণে, ওয়াকফে জিন্দেগী যদিও ওয়াকফ-ই থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেবা করতে পারেন নি, আর এভাবে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাই বলতে হয় যে, এভাবে তিনি

মাত্র কয়েক মাসই রীতিমত কাজ বা সেবা করা ছাড়া অতিবাহিত করেছেন। আর এক দিক থেকে সেবা করতে করতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব লিখেন যে, মরহুম অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং আনুগত্যশীল ছিলেন। অনেক নম্র প্রকৃতির ছিলেন। জামা'তী যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করতেন। তার রিপোর্ট করার অভ্যাস ছিল, সাথে সাথে কাজের রিপোর্ট করতেন। ম্যানচেস্টারে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন সেখানে 'দারুল আমান' মসজিদ নির্মিত হয়। মালেক সাহেব মসজিদের জন্য তহবিল একত্র করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন, আকরাম সাহেব উন্নত চরিত্র এবং গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবান, বিশ্বস্ত, খুবই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত কর্মঠ মুবাল্লেগ, দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ সম্পাদনকারী, খিলাফতের আনুগত্যে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মসেবক ছিলেন। মজীদ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেন, অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তিনি খিলাফতের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। তিনি তবলীগের অত্যন্ত শখ রাখতেন। শিয়ালকোটি সাহেব বলেন যে, যখন ছাত্র ছিলেন তখনও আমাদের ছাত্রাবস্থায় একবার ছুটিতে আমাদের গ্রামে আসেন, তখন সেখানেও তাকে তবলীগ করতে বলা হলে তিনি তবলীগ করা আরম্ভ করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্'র অধীনে সেবা করার জন্য নিজের ছুটি এবং অবসর সময়কে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে জীবন যাপন করেছেন। আসলাম খালেদ সাহেব, যিনি লন্ডনে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে সেবা করছেন, তিনি বলেন, আমার এই প্রিয় ব্যক্তি তার নিজের বিয়ের কারণে পরবর্তীতে আমার আত্মীয়ও হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আত্মীয় ছিলেন। তিনি লিখেন, যেখানে তার পদায়ন হয়েছে সেখানেই অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে জামা'তের সদস্যদের মনজয় করেছেন। আর যেখানে যেখানে তিনি সেবা করেছেন, বিশেষত ম্যানচেস্টার জামা'তের সদস্যদেরকে অসুস্থতার সময়ও অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন। জামা'তের শিশু এবং যুবকদের সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, খালেক সাহেব আমাকে বলেন, সেসব শিশু যারা এখন যৌবনে পদার্পন করেছে এবং যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে একজন নিজের বিয়ের পর যখন প্রথম সন্তানের জন্ম হয় তখন রাত আড়াইটা বা তিনটার দিকে আমাকে ফোন করে বলে যে, মুরব্বী সাহেব! আমার ঘরে ছেলের জন্ম হয়েছে। আকরাম সাহেব বলেন, প্রথমে আমি মনে মনে বলি, এত রাতে সংবাদ দেয়ার এটি কেমন সময়! সকালেও বলতে পারতো। কিন্তু সেই যুবকের নিজ মিশনারী, মুবাল্লেগ এবং তরবীয়তকারীর সাথে যে ভালোবাসা ছিল তার মাধ্যমে সে পরবর্তী বাক্যে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। সেই ছেলে বলে, মুরব্বী সাহেব! আমি এই শপথ করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যখনই আমাকে সন্তান দান করবেন, আমি সবার আগে আপনাকে জানাব। তাই আপনাকে জানানোর পর এখন আমি আমার পিতাকে অবহিত করব। অতএব এ ছিল তার প্রতি মানুষের এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তার আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার মাগফিরাত করুন। তার পরিবার পরিজনকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। তার জানাযা হাযের হবে। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর বাহিরে গিয়ে আমি তার জানাযা পড়াব।

দ্বিতীয় জানাযা হলো জামা'তের মুবাল্লেগ চৌধুরী আব্দুশ শকূর সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি ছিলেন চৌধুরী আব্দুল আযীয শিয়ালকোটি সাহেবের পুত্র। ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৩৫ সনের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা ১৯০১ সনে বয়আত করেছিলেন। মোকাররম আব্দুশ শকূর সাহেব এফ এ করেন, এরপর শাহেদ করেন, মৌলভী ফাযেল করেন, আর ১৯৫৬ সনের জুন মাসে জীবন উৎসর্গ করেন। এর পূর্বে তিনি রেলওয়ে বিভাগে টাইপিস্ট বা মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে কাজ করছিলেন। ১৯৬২ সনে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৬৩ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ পাশ করেন। ১৯৬৩ সনের জুলাই মাস থেকে ওকালতে মাল সানী-তে তার নিযুক্তি হয়। এরপর রাবওয়ার বিভিন্ন দপ্তরে সেবা করতে থাকেন। ৬৪ সনে ইসলামের তবলীগের জন্য তাকে সিয়েরালিওন প্রেরণ করা হয়। ৬৮ সনের নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ৭০ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে ৭৩ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঘানায় ছিলেন। ৭৫ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত গাম্বিয়ায় অবস্থান করেন। ১৯৮০ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৮৬ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত লাইবেরিয়ায় সেবা করার সুযোগ পান। মরহুম এসব দেশে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯০ সনে নায়েব উকীলুত তবশীর হিসেবে তার নিযুক্তি হয়। নায়েব উকীলুল মাল সালেস, আবাদী কমিটির সেক্রেটারী, নায়েব উকীলুল মাল সানী হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। আর ১৯৯৫ সনে অবসরের পর ২০০৪ সাল পর্যন্ত পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। চোখের কষ্টের কারণে আর কালো ছানি পড়ার কারণে ২০০৪ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তার পুত্র আমেরিকা নিবাসী ডাক্তার আব্দুস সবুর সাহেব বলেন, আমার পিতা খুবই সরল এবং পরিশ্রমী ছিলেন। আমরা লাইবেরিয়ায় মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে তাকে তবলীগি এবং তরবিয়তী কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। সবসময় অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে খুতবার প্রস্তুতি নিতেন। কুরআন শরীফ, হাদীস, জামা'তের বইপুস্তক এবং বাইবেল ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে খুবই উন্নত মানের খুতবা দিতেন। খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তবলীগ করতেন আর খুবই আন্তরিকভাবে কথা বলতেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের সব ভাই বোনদের শিক্ষার সমস্ত খরচাদি নিজের সীমিত উপার্জন থেকে পূরণ করেন আর আমাদের সবাইকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন।

পাকিস্তানে আনসারুল্লাহ্'র কায়েদ উমূমী মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, তিনি নীরব সেবক ছিলেন, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং উন্নত পরামর্শদাতা ছিলেন। নায়েব উকীলুত তবশীর শেখ খালেদ সাহেব বলেন, তিনি খুবই নম্র স্বভাবের, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, খিলাফত এবং জামা'তের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত ছিলেন। জার্মানীর বর্তমান নায়েব আমীর হায়দার আলী জাফর সাহেব বলেন, আব্দুশ শকূর সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সরল, নম্র প্রকৃতির, পরিশ্রমী, জামা'তের অর্থ খুবই সাবধানতার সাথে খরচ করতেন। একজন মুত্তাকী এবং নীতিবান মানুষ ছিলেন। লাইবেরিয়াতে জামা'তের বুক-শপকে খুবই ভালোভাবে পরিচালনা করেন আর তা থেকে যে আয় হয় সেটি দিয়ে মসজিদ এবং মুরব্বী হাউস নতুনভাবে নির্মাণ করেন। স্বল্প জায়গায় তিনি ছোট একটি কমপ্লেক্স বানিয়ে দেন, যাতে লাইব্রেরীও ছিল, মেহমানখানাও ছিল, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য মসজিদে পৃথক পৃথক অংশ ছিল, মুরব্বী হাউসও ছিল। মসজিদ

নির্মাণের সময় শ্রমিকদের সাথে নিজেও কাজ করেছেন। প্রথমত নিজে উপার্জনের পথ সৃষ্টি করে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কমপ্লেক্স বানিয়েছেন, এরপর নিজে শ্রমিকের মতো কাজও করেছেন। হায়দার আলী সাহেব বলেন, ১৯৮৬ সনে যখন আমি তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেই তখন তাকে সেখানে বিদায় জানানো হয়, আর মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের কথা যখন উল্লেখ করা হয় যে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে এই সমস্ত কাজ করেছেন এবং খুবই প্রশংসা করা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত বিনয়ে সাথে বলেন, আমার পূর্বে জামা'তের একজন মুবাল্লেগ এই জায়গা ক্রয় করার তৌফিক পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই তৌফিক দিয়েছেন যে, আমার কার্যকালে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনারা এখানে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। আর আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহই আমাকে এই তৌফিক দান করেছে। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া দুই কন্যা এবং তিন পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো ওয়াকফে জাদীদ মুয়াল্লেম মোকাররম মালেক সালেহ মুহাম্মদ সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি গত ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বড়নানা মালেক আল্লাহ্ বখ্শ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখে লোধরা থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তার পিতা মোকাররম গোলাম মুহাম্মদ সাহেব জামা'তের প্রাথমিক মুয়াল্লেমদের একজন ছিলেন। অর্থাৎ তার পিতাও মুয়াল্লেম ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়স বেশি হওয়ার কারণে ভর্তি হতে না পেরে কোটরি-তে একটি কারখানায় চাকরি করতে আরম্ভ করেন। তার পুত্র লিখেন যে, আমার দাদা মুয়াল্লেম মালেক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব তার সাথে কোটরি-তে সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানকার পরিবেশ তার কাছে ভালো লাগেনি। তিনি সাথে সাথে তাকে নসীহত করেন যে, চাকরি ছেড়ে দাও এবং ওয়াকফে জাদীদের অধীনে মুয়াল্লেম হয়ে নিজের জীবন ওয়াক্ফ কর। অতএব তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন, তখন তার বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। চাকরি করার সময় সে যুগে তিনি বেতন হিসেবে সাড়ে চারশত রুপি পেতেন। কিন্তু তিনি এসে মুয়াল্লেম ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান এবং মুয়াল্লেম হন, যেখানে জামা'তের পক্ষ থেকে ১৩৫ রুপি মাসিক ভাতা দেয়া হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন এটি অনেক বড় সম্মান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন। প্রায় এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ আয়ে তিনি ওয়াকফ করেন, পূর্বে জাগতিক আয় উপার্জন করছিলেন। ১৯৮৯ সনে নগরপার্কার-এ তার নিযুক্তি হয়। তখন খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল। তার পুত্র, যিনি নিজে জামা'তের মুরব্বী, তিনি লিখেন, আমার মা বলেন, যখন নগরপার্কারের একটি গ্রাম খাবাস-এর সেন্টারে তার বদলী হয় তখন সেখানে দীর্ঘকাল থেকে মুয়াল্লেম হাউস বন্ধ ছিল, ঘর ভেঙে পড়েছিল। তাই আমার পিতা অনেক দূর থেকে দিনের বেলা পানি ও মাটি নিয়ে আসতেন এবং জমা করতেন, আর রাতে উভয় স্বামী-স্ত্রী মিলে কাঁচা ইট প্রস্তুত করতেন। ইট প্রস্তুত হয়ে গেলে উভয়ে মিলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজেরাই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নেন। সেখানে থাকার কোন জায়গা ছিল না। প্রাথমিক মুয়াল্লেম যারা ছিলেন, সিন্ধু প্রদেশেও, তারা অত্যন্ত কুরবানী করে সেখানে দিনাতিপাত

করতেন। নিজেরাই অনেক দূর থেকে পানি বহন করে আনেন, মাটি জড় করেন, এরপর ইট প্রস্তুত করেন এবং নিজেরাই নিজেদের থাকার ঘর প্রস্তুত করেন, জামা'তের কাছে কোন কিছু দাবি করেন নি। তার পুত্র আরো লিখেন, তিনি বলেছেন, নগরপার্কারে তার কাছে সুযোগ সুবিধা ছিল না, তাই যখন মিটিংয়ে যেতেন তখন নিজের জন্য পুরো মাসের রেশন ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসতেন, কেননা খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতেন। একবার এভাবেই মিটিংয়ে এসেছিলেন এবং যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলেন। সেই অঞ্চল মরুভূমির অঞ্চল আর বালির ওপর পদচিহ্ন দেখে মানুষ পথ চিনে নিত। তিনি সঠিকভাবে পদচিহ্ন চিনতে পারেন নি আর পথ হারিয়ে ফেলেন। ইত্যবসরে তার পানিও শেষ হয়ে যায়। সিন্ধু প্রদেশে অনেক গরম হয়ে থাকে। তৃষ্ণা ও ক্লান্তির কারণে পরিশেষে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সেখানে যখন পড়েছিলেন তখন দুই ব্যক্তি উটে আরোহিত অবস্থায় সেই পথ দিয়ে যায়। তারা দেখে যে, কোন ব্যক্তি বালির ওপর পড়ে আছে। যখন তারা কাছে আসে তখন দেখে যে, ইনি তো ডাক্তার সাহেব। নগরপর্কার-এ তিনি যেহেতু মানুষকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন তাই ডাক্তার সাহেব নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন আর এই দুই ব্যক্তি তার রোগী ছিল। তারা তাকে চিনতে পারে, পানি পান করায়, তাকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসে। সেখানে তিনি রাত অতিবাহিত করেন, আর পরের দিন তারা তাকে সেন্টারে ছেড়ে আসে। তিনি আরো লিখেন, নিজ সন্তানদের নামাযের জন্য নসীহত করতেন। একান্ত নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিনও তাহাজ্জুদ আদায় করেন আর মাকেও জাগান। খুবই সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ছিলেন। কেউ অসদাচরণ করলেও সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতেন, কখনো প্রতিউত্তর করতেন না। মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। মানুষ তার বিশ্বস্ততার কারণে তার কাছে আমানতও গচ্ছিত রাখতো। তিনি বলেন, কোন পরিবারে কখনো মনোমালিন্য দেখা দিলে সর্বদা তাদের মাঝে মিমাংসাকারী ছিলেন।

মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিনি পুত্র এবং তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুবারক আহমদ মুনীর সাহেব বুরকিনা ফাসো-তে জামা'তের মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন, আর এ কারণে নিজ পিতার মৃত্যুতে পাকিস্তানেও যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরও সেই প্রেরণা এবং কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মসেবার তৌফিক দান করুন।

চতুর্থ জানাযা হলো মোকাররম মুওয়েশে জুমা সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি তানজানিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৩ মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। ১৯৩৩ বা ৩৪ সনে তানজানিয়ার মোরোগোরো রিজিওনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তার জামা'তভুক্ত হওয়ার ঘটনা হলো, সেখানে সুন্নী আলেমদের মাঝে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, মৃতদের জন্য (কুরআন) খতম দেয়া এবং মৃত শিশুদের আকীকা একই সাথে করা হতো। এই বিষয়ে তিনি মতভেদ পোষণ করতেন যে, এটি কিসের খতম দেয়া আর মৃত শিশুর জন্য কেমন আকীকা! তিনি বলেন, তাদের কতিপয় সুন্নী আলেম যে শিশু জীবিত আছে তার পরিবর্তে যে শিশু তাড়াতাড়ি মারা গেছে তার আকীকা করার প্রতি জোর দিত যেন খতম দিয়ে আর আকীকা করে বারবার

খাবারের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয়। তিনি ইসলামী শিক্ষায় এমন কোন নির্দেশ পান নি যার ওপর এসব মৌলভী আমল করছিল। তখন তিনি খুবই দুঃখ পান এবং মুসলমানদের এই অধঃপতিত অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হযরত ঈসা (আ.)-কে অবতীর্ণ কর যেন তিনি এসে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, তার নিজের বক্তব্য অনুযায়ী যখন সেখানকার জামা'তের মুবাল্লেগের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, তখন সেখানে জামা'তের মুবাল্লেগ ছিলেন জামিলুর রহমান রফিক সাহেব, যিনি বর্তমানে পাকিস্তানে উকীলুল ইশায়াত, তখন তিনি তাকে বলেন, মহানবী (সা.) এর হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে চেনে নি সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, এতে তিনি মনে করেন যে, আমি যেহেতু যুগ ইমামকে মান্য করি নি তাই আমি প্রকৃত মুসলমান নই, তাৎক্ষণিকভাবে তার এই ধারণা হয়। এরপর কোন কালক্ষেপন না করে তিনি তৎক্ষনাৎ বয়াআত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর তিনি নিজ গ্রামে যান, নিজের ভাইবোনদের তবলীগ করেন, পরিবার পরিজনকে তবলীগ করেন, বন্ধুবান্ধবদের তবলীগ করেন এবং সবাইকে একত্রিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাণী পৌঁছে দেন। আর সে বছরই তার ভাই ঈদী সোলেমান সাহেব, যিনি মারা গেছেন এবং জুমা সাহেব ও তার স্ত্রী তার তবলীগে তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেন। মরহুম ভয়াবহ বিরোধিতারও সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ জামা'তভুক্ত হতে আরম্ভ করে, আর তার গ্রাম মাকিউনীর পাশাপাশি আশেপাশের যত গ্রাম রয়েছে, সেখানেও জামা'তের বেশ ভালো সূচনা হয়। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, মাকিউনী জামা'ত এখন মোরোগোরো রিজওনের একটি আদর্শস্থানীয় জামা'ত। আর এটি তারই পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। জামা'তভুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রতিটি আমল থেকে এটিই প্রকাশ পেত যে, তিনি খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত। মুবাল্লেগ এবং জামা'তী কর্মকর্তাদেরও তিনি অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনার খুবই আনুগত্য করতেন। তবলীগের জন্য খুবই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল। সর্বদা তবলীগে রত থাকতেন, কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে গন্য হতেন। বরং সর্বদা এই চিন্তায় থাকতেন যে, কোন প্রকার আয় হলে তার চাঁদা দিতে হবে আর বলতেন যে, এই সাময়িক জগতের কোন মূল্য নেই। তিনি মূসী ছিলেন আর মানুষকেও এই বরকতময় তাহরীকে অংশ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। নামায প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নিজের উদাহরণ তিনি নিজেই ছিলেন। নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত পড়তেন। আর নিজ সন্তানসন্ততি, পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরও বাজামা'ত নামাযী বানানোর নসীহত করতেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। মহানবী (সা.) এর বহু দোয়া তার স্মরণ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠেরও গভীর আগ্রহ ছিল। তার পুত্র শামুন জুমা সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়ায় শিক্ষক হিসেবে আছেন, তিনি বলেন, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমরা তিন ভাই তানজানিয়া জামেয়ায় পড়তাম। সেখানে মুবাশ্বের কোর্স হয়ে থাকে। আমার স্মরণ আছে যে, একবার ছুটির সময় আমরা ভাইয়েরা নিজেদের মাঝে এই পরামর্শ করি যে, আমাদের এক ভাই জামেয়ার পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসবে আর পিতামাতার দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করবে। আমরা আমাদের পিতাকে এই কথা জানালে তিনি এটি খুবই অপছন্দ করেন। তার পুত্র শামুন জুমা সাহেব লিখেন যে, আমি সেই দিনের কথা ভুলতে

পারি না, আমাদের পিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন আর তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা কর এবং জামেয়ার পড়াশোনা অব্যাহত রাখ, কোন অবস্থাতেই পড়াশোনা ছাড়বে না। এভাবে তিনি নিজের তিন সন্তানের মাঝে জামা'তের সেবা করার এক স্পৃহা সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার বংশধরদেরও প্রকৃত ধর্মসেবক এবং ইসলামের সেবক বানিয়ে দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের সবার জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হলো হাযের, যা মালেক আকরাম সাহেবের জানাযা। আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর আপনারা এখানেই মসজিদের ভেতরে থেকে আমার সাথে নামাযে যোগ দিবেন।